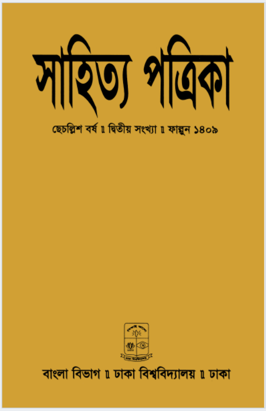

Vol. 46 | No. 2 | 2003

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কমলকুমার মজুমদারের 'জল' ও 'তেইশ'-এর সমাজবাস্তবতার স্বরূপ

Volume	46
Issue	2
Year	2003
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Seraj Salekeen
Published online	February 1, 2003
DOI	10.62328/sp.v46i2.338
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v46i2.338
Pages	১০৯-১২০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কমলকুমার মজুমদারের
'জল' ও 'তেইশ'-এর সমাজ

Check for updates

সিরাজুল ইসলাম *

কমলকুমার মজুমদারের (১৯১০-১৯৭৯) সর্বমোট গল্পের সংখ্যা ত্রিশ ; এর মধ্যে একটি অসমাপ্ত। এই স্বল্প সংখ্যক গল্প নিয়েই তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম আলোচিত গল্পকার।[১] মুলত তাঁর গল্পের প্রকরণ-কৌশল ও ভাষারীতিই বোদ্ধা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষক কেন্দ্র ও বিতর্কের উৎস। শব্দ-সচেতন অনুশীলন, পাঠকের বোধের প্রতি বিশ্বাস ও ধ্রুপদী মগ্নতা নিয়ে সৃষ্ট হয়েছে তাঁর গল্পভুবন। উনিশ শতকীয় ও উপনিবেশক নিয়ন্ত্রিত নবজাগরণস্পর্শী গদ্যের আধুনিকতা নিয়ে তাঁর বিতৃষ্ণা অস্পষ্ট নয়। তাঁর আগ্রহ ঐতিহ্য-উদ্ভূত বাংলা গদ্যের প্রতি। তবে আধুনিকতার এই অসংগতি মোচনের জন্য ভিন্ন-প্রান্তিক দুরূহ-প্রায় প্রয়াস অনন্য হলেও তার সার্থকতা প্রশ্ন সাপেক্ষ। তাঁর গল্পের ভাষা-বিতর্ক সমালোচকদের আকৃষ্ট করেছে সত্য; তবু বিষয়-বৈশিষ্ট্যে 'জল', 'তেইশ', 'মল্লিকাবাহার', 'মতিলাল পাদরি', 'তাহাদের কথা', 'নিম অন্নপূর্ণা', 'কয়েদখানা' প্রভৃতি গল্প বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সৃষ্টিসম্পদ। কমলকুমার মজুমদারের 'জল' ও 'তেইশ' গল্পে বিধৃত সমাজমনস্তত্ত্বের আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কমলকুমার মজুমদারের প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় বিশ শতকের চতুর্থ দশকের শেষার্ধে। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী বাঙালির রাজনৈতিক টানাপোড়েন, বিশ্ববাণিজ্যমন্দা ও আধুনিকতাবাদের উত্তুঙ্গ প্রকাশ-পর্বেও তিনি প্রথম তিনটি গল্পে স্বপ্নচারী। 'লালজুতো', (১৯৩৯) 'প্রিনসেস' (১৯৩৭) ও 'মধু' (১৯৩৮) গল্পত্রয়ে মধ্যবিত্তের কল্পনাধর্মী আকাঙ্ক্ষা 'কাব্যবীজময় প্রতীকতায় উদ্ভাসিত।[২] 'মধু' গল্পে মধ্যবিত্তের নিঃসঙ্গতা নিয়ে যে 'বাবু' উপস্থিত, তার শ্রেণীবাস্তবতা, কল্পনাপ্রবণতা , নারী-ভাবনা ও নিম্নবিত্তের সঙ্গে সম্পর্কবিলাস শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে বিবেচিত। মানব-সম্পর্ক সৃষ্টি তার অন্তর্প্রেরণা নয়, বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতাই তার মৌল বাস্তবতা। ফলে মধু বিক্রেতা নারীর 'কলাবতী' নামে মৃত্তিকালগ্ন বস্তিবাসী নয়,— আত্মসৃষ্ট রতিমুখাপেক্ষিতার নিদর্শন। এই জন্যই কথকের উচ্চারণ : 'পৃথিবীতে

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমার কেউ ছিল না বললে— ভুল করা হবে, বলবো আমি কারু ছিলাম না।' এই স্বপ্ন-কল্পনা ও আত্মগত বিচ্ছিন্নতা থেকে কমলকুমারের মনস্তাত্ত্বিক মুক্তি ঘটে 'জল' (১৯৪৮) ও 'তেইশ' (১৯৪৮) গল্প দুটিতে। কমলকুমারের 'মধু' থেকে 'জল'-এ উপনীত হওয়ার মনোভঙ্গিটি সামাজিক। গল্পের বিষয়বস্তুকে স্বীকার করে তিনি ভূমি-উৎকেন্দ্রিক জীবনযাপনজনিত যে বিচ্ছিন্নতা তার প্রক্ষোভ-অবসান ঘটিয়েছেন 'জল' গল্পে।[৩] কৃষি জমিতে নোনা-জলাবদ্ধতা ও তা নিয়ে দুর্ভাবনার দীর্ঘ প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য অন্ধকার রাত্রির রূপাবয়বে আবির্ভূত হয়েছে, যাকে টিনের ল্যাম্পের সামান্য আলো দিয়ে দূর করা যায় না। রুগ্ণ ফাতিমার মাতৃদৃষ্টিতে যে মাতা ভারতীয় হৃদয়ে অন্নপূর্ণা— কেবল অন্ধকার ধরা পড়ে। বাইরের 'ক্রমাগত অন্ধকার, যত দেখে তখন মনে হয় ভয়ঙ্কর!' কর্মহীনতা ও খাদ্যাভাব নিয়ে বোল্‌দে গ্রামের নিরুপায় দুটি পরিবার ; ফজল ও নন্দ— ক্ষুধার পীড়নে হিন্দু-মুসলমান ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে অস্তিত্ব সংকটে নিপতিত। অর্থসংগতি নিয়ে যাদের সম্ভব হয়েছে তারা চলে গেছে নোনা ধরা গ্রাম ছেড়ে, কিন্তু ফজল-নন্দের উপায়হীনতা সম্ভব করে তুলেছে কোন সম্প্রদায় নয়, নিরন্নের ঐক্য। ডাকাতি তাদের পেশা নয়, কেবল টিকে থাকার দায় নিয়ে কৃষক পরিণত হয় লুণ্ঠক-ডাকাতে, এক্ষেত্রে অমানবিকতার প্রশ্ন অবান্তর। অন্ধকারে আলো হাতে দুজন পথযাত্রীর জন্য অপেক্ষা, ডাকাতি নয়, যেন আলোরই প্রতীক্ষা কেবল; ফজলের মন্তব্য সেই অন্ধকার— বিরোধাভাস, 'খুড়া লণ্ঠনটা কিন্তু আমারে দিতি হবে হ্যাঁ...।' কৃষকের সঙ্গে জমিদারের সম্পর্ক খাজনাসহ আর্থনীতিক, নোনা জলে ভবিষ্যৎ-ভয়ঙ্কর অসৃষ্টিশীলতা নিয়ে নয় ; ক্ষোভ যদিও ফজলের 'শালা বড় বাবুর মুণ্ডু কেটে আনি' জোটবদ্ধ হয়ে, অবশ্য নন্দ জানে, বাবু 'এ পথে আসবে না রে...'। শ্রেণী-পথের ভিন্নতায় শত্রু সহজেই চেনা সম্ভব এবং পথের বন্ধু সম্প্রদায় বিরুদ্ধতা মানে না। তারা ডাকাত হতে বাধ্য অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে— শহরের বাবুদের প্রতি তাদের বিদ্বেষও প্রান্তিক জনোচিত। নামহীনতার বোধ নিয়ে অস্তিত্বের মহাসংকট মুহূর্তে নন্দ বলেছে, 'দেখ, নাম ধরে ডাকবি না, তোর নাম কানাই, আমার নাম ঐ, আমার নামও কানাই। খবরদার দেখিস মোল্লার পো।' দারিদ্র্য সৃষ্টি করে নামহীনতা ও নিরস্তিত্বের বোধ-সংকেত, বরং এজন্যই নন্দ পরিণত হয় কালো ছায়ায়, আর ফজল নিজের শরীরে অন্ধকার দেখে ভয় পায়। এই অন্ধকার-ভীতির ইতিবাচকতায় অস্তিত্ব সচেতনতার আলোকদ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়। পরিচয় হারিয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে ধর্ম-সম্প্রদায় নিরপেক্ষতা নিয়ে ক্ষুধা

সম্মিলন মানুষের মহাবোধকে আড়ষ্ট করে তোলে সাময়িকভাবে। পথপ্রবঞ্চনার স্থবির অপেক্ষার অনন্ত মুহূর্তগুলোর উত্তেজনা, ভীতিচকিত মন ও শরীরের শীত অস্তিত্বেরই অন্যতম উপাদান। ফলে এক সময় ফজলও দ্বিধাক্ষুব্ধ মনে আত্মশ্লেষাত্মক হয়ে ওঠে :

> ক. ফজল এখন ঝোঁপের ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করছিল, এখন সে ভুলেই ছিল; তার হাতে একখানা ধারাল দা আছে, আর সে হয় ফজল। অতঃপর ইত্যবসরে হঠাৎ সে অধৈর্য্য অস্থির যে সে কি করে এবং হস্তধৃত দা দিয়ে ছোট একটা কোপ দিয়েছিল, ঝোপের একটা ডালে, সঙ্গে সঙ্গে ডালটা মাটিতে পড়ে। এবার সে নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করতে থাকল, ভয় নেই। [*গল্পসমগ্র*, পৃ. ৩৪-৩৫]

> খ. 'না আমি কিছুই চাই না সব নন্দ খুড়ো নিক। পরের ধন নেওয়া পাপ, খোদা রাগ করেন। আমি হই ফজল, আমি হই ভাল লোক, লোক না থাকলেও আমি তড়পা গুণে নি, আমি পরের ক্ষেতে ধান কাটি না, আমি হই ভাল লোক, কেননা খোদা একদিন মুখ তুলে চাইবেন। [*গল্পসমগ্র*, পৃ. ৩৫]

দ্বিধা-সংকট নিয়ে ফজল অন্ধকারে নিমজ্জিত। দুটি উদ্ধৃতির মনোভাবেই ফজল শুদ্ধ অস্তিত্বের আদর্শচিহ্নিত হয়ে মানবিকতায় উত্তীর্ণ হতে চেয়েছে কিন্তু ভালো হওয়ার আদর্শ নিয়ে জীবনধারণ সম্ভব হয়নি। ফলে 'আমি হই ভাল লোক' (এই কেন্দ্রীয় উক্তি) কেবল মুখোশের মূল্য পেয়েছে। এই মুখোশ ছুড়ে ফেলার মধ্যেই আপাত মুক্তি; অবশ্য দ্বিধা মহামানবিক সংকল্পের অনুপ্রবেশে। এক্ষেত্রে কমলকুমার নিরপেক্ষ মানবিকতার ধারাবাহিকতায় বিশ্বাসী, এবং অস্তিত্ব-সংকটের তীব্র পীড়ন ক্ষণস্থায়ী পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচনায় আগ্রহী। এজন্যই শ্রাদ্ধ-ফেরত দুই ব্রাহ্মণের পথরোধকালে ভয় মিশ্রিত ফজলের সচেতনতাকে অবলুপ্ত করে দেন গল্পকার। তার আকস্মিক আক্রমণাত্মক মনোভাব সুস্থতার পরিচয় বহন করেনি, বরং একে আনাড়ির অতি-প্রবণতা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। ডাল-চাল-মসলা, টাকা, ট্যাকে গোঁজা কুইনিন পর্যন্ত কেড়ে নেয় তারা— বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আকুতি তাদের হৃদয় স্পর্শ করেনি এবং বালকের প্রতিও তারা আচরণে রূঢ়। সমগ্র পরিস্থিতিতে মানবিক অপচয়কে অনুভব করেছেন গল্পকার। ডাকাতির অনিবার্যতা অস্তিত্বের প্রশ্নে অস্বীকৃত না হলেও, সমাজনির্ভর মূল্যবোধ ভিন্নতর এক দ্বন্দ্বময়

চেতনার সৃষ্টি করে। ফলে ব্রাহ্মণের আকুতি ও ক্ষুধাচিত্রের স্পষ্ট বাস্তবতাও গল্পকারের আনুকূল্য পায়। ফজলের দ্বিধাসত্ত্বেও মানবিকতার ঐতিহ্যছাপ :

> 'কেটে ফেল শালাদের, কেটে ফেল'— লাফ দিয়ে এল নন্দখুড়ো। আবার বললেন— 'কেটে শালাদের টুকরো কর দিনি— কর শালাদের, কানাই।' 'কানাই'— কানাই হয় তার নাম। সে ফজল মোল্লা নয় এবং যে ফজল হয় ভাল লোক— পরের ধান কাটে না, কেননা খোদা তার উপর দয়া রাখেন। কিন্তু যদি সে কানই! সে যা যা করে। প্রত্যেকের প্রতি ফজল কেমন করে...! তার হাঁটু ভরা আলো, লোক দুটি তার তার সামনে আর সে হয় কানাই। [*গল্পসমগ্র*, পৃ. ৩৬]

তিন দিনের উপোসি পরিবার নিয়ে যন্ত্রণার প্রেক্ষাপটে লুণ্ঠকে পরিণত হওয়া— যদিও বড় কিছু নয়, স্বশ্রেণীর মানুষই লুণ্ঠনের শিকার এবং তাতে পাওয়া গেল চাল-ডাল মসলাপাতি সবই। ভাগ-বাটোয়ারা নিয়েও কোনো সংকট দেখা দেয়নি। যেন ইচ্ছাপূরণ গল্পের সমাপ্তি নিয়ে ঘটনার জালবোনা, যাদু রহস্য নেই। কিন্তু মানুষের অন্তর্লোকের জটিলতা নিয়েই এই গল্পের বিন্যাস। ঘটনার বহুদূরে মনের মীমাংসা, ফজলের ভীতি ও অপরাধবোধ :

> যখন ফজল এবার নিজের দিকে তাকালে। চারিপাশে কুয়াশাচ্ছন্ন। বারম্বার যখন তাকে কয়েকটি কথা ধাক্কা দিতে থাকল, যদি দিতে থাকল অথচ সে হতচকিত হয়েছিল। আবার সে দাঁড় টানতে লাগল। এবং এমতাবস্থায় তার মন একরূপ শূন্য হয়েছিলই, ফলে ধীরে কিয়ৎক্ষণ পর তার ভয় উপজিল, তন্মুহূর্তে এও সে ভেবেছিল এছাড়া সে আর কি করতে পারত; শুধু, শুধু ঠিক তারা মরতেই পারত। মরতেই পারত। [*গল্পসমগ্র*, পৃ. ৬০]

অপরাধবোধ থেকে মুক্তি নেই এবং তা ক্ষুধার মতোই অস্বস্তিকর ও অস্তিত্বের সংকট নিয়ে আবির্ভূত হয়। ফজল যখন শেষবার বলেছে 'ঠাকুর তো গরীব', তখন নন্দের প্রত্যুত্তর 'গরীব যেন যাত্রার পোষাক'। অপরাধবোধ অস্বীকারের মাধ্যমেই নন্দ স্থিতি লাভ করে এবং ঠাকুর-প্রহারের ঘটনাও তার নিকট জীবনের প্রয়োজনে মীমাংসিত। ফজলের প্রশ্নে কেষ্টঠাকুরের প্রসঙ্গ এলে নন্দখুড়ো জবাব দেয়: 'জানতি যদি পারি, বলব, ঠাকুর... সোনাদানা চাই না ঠাকুর আমাদের বাঁদ

তুমি অচল করে দাও— লোহার করে দে যাও— লোনা জল যেন কখনও না এর মদ্দি আসতি পারে... আর হ্যাঁ অজন্ম যেন হয় না ঠাকুর... দূর তাই কখনও হয়... তুমি যেমন! ঠাকুর যাবে বাবুদের বাড়ি, খাটের জোগাড় যেখানি বারমাস অষ্টপহর, আমাদের মত দুঃক্কী কাঙালের সঙ্গি শালা দেখা হবে উঠতি বসতি শালা মেজে ঠাকুরের...'। শ্রেণী সংঘাত ও পরজীবিতা নিয়ে সমাজতন্ত্রের ও দার্শনিকতার প্রত্যক্ষ প্রভাবে বিদ্রোহ বিদ্যমান, তবু পরবর্তীকালে আশা-নিষ্ক্রিয়তায় নির্জীব তারা। ফজলের ভীতিতাড়িত উন্মার্গ লুণ্ঠনদৃশ্য নাটকীয় বটে, অস্তিত্বের পক্ষে ভয়ঙ্কর, অন্তঃশূন্যতারও পরিচায়ক।

ফজলের নীতিবোধ ও ধর্মলগ্ন শান্তিবিশ্বাস এবং এর বিপরীতে বেঁচে থাকার প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় ভেঙেপড়া মনস্তাত্ত্বিক পরিচয় কথাবস্তুর আশ্চর্য পিছুটান। অনতিক্রমণীয় দ্বন্দ্বক্ষুব্ধতা নিয়েই ফজলের শেষ পরিচয়; খাদ্য সংগ্রহ-পরবর্তী দৃশ্যে মাতৃসান্নিধ্যের উচ্ছ্বাসে বিশ্বস্ত থাকেনি সে। সন্দেস-আহারে নিরত মাতৃপ্রহার দৃশ্যান্তরের নাটকীয়তা মাত্র নয়, প্রায়শ্চিত্তেরও পর্ব। অপরাধবোধ আক্রান্ত মনস্তত্ত্বে ফজল অস্তিত্ব রক্ষার জন্য খাদ্য সংগ্রহ ও নীতিবোধের মীমাংসায় উপনীত হতে ব্যর্থ এবং শেষ পর্যন্ত সে নৈরাজ্যিক পরিস্থিতিতে নিপতিত হয়। শুধু তার মনে হল— 'ফজল হয় ভাল লোক'। একবার হয়ত বা সে মাথা ঝাড়া দিয়ে বলেছিল, সে কানাই সে কানাই— 'ফজল নয়।' তবু বিশ্বাসের ছায়া ও নীতিবোধের প্রশ্রয়ে কিন্তু অর্থনৈতিক শোষণে অসচেতন ফজল বাবুদের দয়ার দান মাছ নিয়ে তৃপ্ত— অধিকার বোধ থেকে দূরবর্তী। লুণ্ঠনের খাদ্য সে গ্রহণ করেনি এবং অপমানিত মাতা উদ্বন্ধনে মৃত্যুবরণ করে। নন্দ খুড়ো ফজলের মাতা ফতিমার মৃত্যু সংবাদ ও কাঁথার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে উপস্থিত হলে ফজলের নিরাকার জীবনের সংলাপ :

ফজল গলা পরিষ্কার করে তখন বললে— 'কাঁথা খান তুমি নেও খুড়ো'— এবং ওর নিশ্বাসে প্রশ্বাসে তখন অন্ধকার এবং 'তোর বউ তো বাঁজা, আমার বুনটারে নিবি...?'

নন্দ নড়বড় করে উঠল এমত কথায়, এখন বলি বলি করে বললে— 'সে নয় হল— তুই? জল তো সরবে, আজ নয় কাল, জলের জন্যি না এত এলাহি।

'না, না, না, আমি দেশত্যাগী হব, কোথাও চলে যাব, থাকব না!'

> নন্দ একটু ভাবলে, হয়ত ভূত হয়ে ওকে যদি ধরে, সেই ভয়েই ও এরূপ বলে।
>
> ফজল হয় ভাল লোক, কেননা খোদা তার উপর দয়া রাখেন। [*গল্পসমগ্র*, পৃ. ৬৩]

ক্ষুধার্ত মানুষের অন্তর্গত নীতিবিশ্বাসকে বিদ্রূপবিদ্ধ করে কমলকুমার আবদ্ধ হয়েছেন মানবীয় অস্তিত্বজিজ্ঞাসার দ্বন্দ্বময়তায়। ক্ষুধা ও সামাজিক নীতিবোধের প্রবল দ্বিধাসত্য নিয়ে মানবীয় সংকটের মীমাংসা সর্বদা অসম্ভব এবং এ-পরিস্থিতি ব্যক্তিকে নিরস্তিত্বমুখী করে দেয়।

॥ ২ ॥

'জল' গল্পের ভূমিকেন্দ্রিক মানুষের আর্থ-সামাজিক অসহায়তার যে রূপ বর্ণিত হয়েছে তার স্তরান্তর দৃষ্ট হয় 'তেইশ' গল্পে। প্রজন্ম পরম্পরায় চাষি-জীবনের দুর্বিসহ বাস্তবতা নিয়ে গল্পটির কাহিনী সংগঠিত। জমিদারি ব্যবস্থায় ভূমি-অধিকারহীন ও ঐক্যের অভাবে নির্যাতিত এবং উচ্ছেদ-উন্মূলতার শিকার আলমের নিরস্তিত্ববোধের অন্তর্বাস্তবতা নিয়ে গল্পটির কথাবস্তু। একখণ্ড জমি, যেখানে চাষির প্রাকৃতিক অধিকার নেই, বরং জমিদারকে খাজনার বিনিময়ে প্রাপ্ত, তা সরল চাষি আলম ভুলে গিয়েছিল। ফলে তার চাষরত অবস্থায়ই জমিদারের নায়েব কর্তৃক জমি নিলাম হয়ে যায় খাজনা-বকেয়ার অপরাধে। চাষীদের পারস্পরিক অনৈক্য, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিবাদ ও দ্রোহের অভাবে এখানে ভাগ্যের ব্যাখ্যা ও জমিদারের দয়ার অভাব নিয়ে আলোচনা চলতে পারে কিন্তু অত্যাচারের প্রতিকার নিয়ে সকলেই বাকরুদ্ধ। সকলেই বিড়ম্বিত, মনোভূমে উন্মূলিত এবং অপর সহায়তার বাণী উচ্চারণ তাদের অসাধ্য। জমিদারতন্ত্রের দূরপ্রসারী ব্যক্তিত্ববিনাশকাল ও কালোচিত চাষী সমাজ— আলমের সঙ্গীসাথী— নির্ভেজাল আত্মপরায়ণতার সূত্রমানা অস্তিত্ব। 'আলম উঠে দাঁড়ালে, কত বড় প্রকাণ্ড ঢাউশ আকাশ, কত কত জমি পৃথিবীতে, পূবে আকাশ, দক্ষিণে, উত্তর আর পশ্চিমে গ্রাম, গ্রাম সবুজ। সে কেবল এক রত্তি ছিল। যারপরনাই অসহায়।' আশা-উদ্দেশ্যহীন আলমের শেষ যাত্রা জনসমাজ বিচ্ছিন্নতা কিংবা বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত জনসমাজের প্রেক্ষাপটে বিবেচ্য।

নিলামে আলমের জমি ক্রয় করে নগা ঢালির ইতঃস্তত মনোভাব বেদনা বা করুণা নয়, অপরাধবোধজারিত হলেও খুব দ্রুতই ক্ষমতাকেন্দ্রে তার অনুপ্রবেশ

ঘটে। প্রান্তিক চাষীর ক্ষেতমজুরে পরিণত হওয়ার সমাজতত্ত্ব নিয়েও নগা ঢালি ও আলমের দ্বন্দ্ব আর্থনীতিক। দ্রুত মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত ও অন্তর্ঘাত সৃষ্টির মাধ্যমে নগা ঢালি চাষি সমাজে নিজের মানবিক অবস্থান ফিরে পেতে চায়। অবশ্য নগা ঢালির জনবিচ্ছিন্নতা তার কূট-উচ্চারণ ও আত্মপ্রচারের অন্তঃসারশূন্যতায় সমন্বিত :

> '... আলম যেমন চষছে চষুক, হাজার হোক ওর বাপ পিতেমোর জমি তো... আমি, আমি, সেদিক দেকবো, ওজন হিসেবে নিক— রোজগন্ডা দেব... আমার মন হয় ও ভাগে চাষ করুক... আমি ওকে তিনপো ধান দেব— 'তিনপো' বলেই সে বোকা হয়ে গেল ; তার মত একটি পাকা লোক এটা কি করলে, কাকে সে হাতে রাখতে চেষ্টা করলে, তাই ফিরে ফিরতি শুদ্ধ করে বললে— 'অবশ্য এই প্রথমবার, যখন বলেছি তখন আমার এককথা, আমি নগা ঢালি, আমায় মন্দ বলতে পারবে না বাপু... আমার আক্কেল আছে... 'আমি ভাল লোক কি বল'— সে বড় মুখ করে, এ কথা বলেছিল। [*গল্পসমগ্র*, পৃ. ৫০]

এই শঠবাক্যে চাষি সমাজ আস্থা স্থাপন করলেও 'কেবলমাত্র আলম একটু অধীর'। আবারও ভালো লোক হিসেবে আত্মপ্রচারে নগা ঢালি সচেতন হলে আলম তার সদ্য নিলামকৃত জমিতে ক্ষেতমজুর হতে অস্বীকৃতি জানায়। অন্য চাষীরা এতে বিস্মিত হয়, কেননা এতে আশংকা থেকে যায় 'ভিক্‌কে করতে হবে যে।'

জমি থেকে উচ্ছেদ ও বাস্তুভিটা হারানোর গভীর ক্ষোভ নিয়েও আলম অসহায়। প্রতিবাদের পথ কিংবা আক্রমণের উপায় সে সামাজিকভাবেই জানে না। প্রতিরোধহীন জনগোষ্ঠীর প্রাণহীনতা, অসহায় অভিমান ও উদ্দেশ্যহীনতা তাকে বিপর্যস্ত করে দেয়। আলমের স্ত্রী একবার মাত্র আর্তরব তোলে, 'আল্লাহর জমি যদি আমাদের হত', কিন্তু আলমের অস্তিত্বে সামাজিক প্রতিস্থাপন : 'জমি কখনও চাষার হয়, জমি কি খাতকের বাপকেলে সম্পত্তি।' অনৈক্য ও অধিকারবোধহীন জনগোষ্ঠীর আত্মসমর্পণের করুণ কথাচিত্র গল্পটি, তবু আলমের স্ত্রীর আকস্মিক উচ্চারণ— 'তুই যদি মানুষ হস্ তো শালাদের কেটে জল খা।' আপাত ক্ষুব্ধ হওয়ার নির্বাতাস পরিস্থিতি তৈরি হলেও মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক পরিবেশে তা সমর্থিত হয়নি, 'দূর তাই কখনও হয়, কত শালার লোক লস্কর।' তবু জমি তাকে তাড়া করে :

মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে সে দাঁতে দাঁত কষছিল; যাই সাবাড় করে দিগে যাই...। সে বড়ই একা, সে একা চিরদিন, সে যে কি করে। একটা হেঁসো তার নেই। হাটখোলার অন্ধকারে বউটা বসে আছে, উপরে ভয়ঙ্কর অন্ধকার, আকাশ মাথায় মাথায়— নীচে কুলকাঁটা অন্ধকার আর দুর্যোগময়ী যামিনী।

তার এক সময় মনে হল, পিছনে খাল বরাবর তার জমিটা আসছে, তার ভয় হল, জমিটা কি ভূত হয়েছে, তার গায়ে কাটা দিয়েছিল। তাকে নাগালে পায় পায়, খানিক পথ আলম দৌড়ায়। জমিটি ভূত হয়েছে, অনেকটি পথ যেয়ে সে থেমেছিল। ফাঁকা মাঠ, উপরে আকাশ, নীচেও আকাশ। [*গল্পসমগ্র*, পৃ. ৫২]

উদ্ধৃতির প্রথমাংশে শ্রেণীবাস্তবতার প্রেক্ষাপটে অনিবার্য দ্বন্দ্বময়তায় অনৈক্যের অন্ধকার রাত্রি যেমন নির্দেশিত; দ্বিতীয়াংশে জমির ছুটে আসার পরাবাস্তব চিত্র অবদমনের স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া, চাষি জীবনের ভূমিলগ্নতার রূপক।

দুটি উপশিরোনামে বিভক্ত উপান্ত-পর্ব কেবল শিল্পকৌশল নয়, জীবনের মুক্ত রূপান্তর কিংবা চাষিজীবনের অনারোপিত উন্মূলতা নিয়েও তাৎপর্যপূর্ণ। লেখক তাঁর সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের সচেতন অন্তর্গূঢ় প্রত্যাহারে সামাজিক দায়িত্ব বা অবস্থানকে এবং সেখানে চাষি আলমের অসহায়তাকে অনন্ত সমুদ্রতুল্য করেছেন। সর্বগ্রাসী নিরাশ্রয়ের রূপবন্ধে লেখকও তাকে সহায়তা করতে পারেননি— জীবনের অনিশ্চয়তার রূপ গল্পের উপান্তর দুটি উপশিরোনামে। প্রথমত, 'শুনেছি শেষটা এমনিভাবে হয়' : বিচ্ছিন্ন, নিরাশ্রয়ী ও উদ্বাস্তু আলম 'দুজ্জোগে'র সংকেত ও শঙ্কা নিয়ে অন্ধকার রাত ও জীবনের ঘূর্ণাবর্তে, বিষ্টু খুড়োর বাড়ি যায় সহায়তার আশায়। তিনটি ডাগর মরাই-এর তাৎপর্যে ধনাঢ্য ও ঝড়ের রাতে বিষ্টুখুড়োর 'সময়-সমাচার' নিয়েও ভাবিত আলম। তবু অগত্যা বিষ্টুকে ডেকে তুলে জানায় :

'আমরা চল খুড়ো— আমরা ক্ষেপে উঠি, ক্ষেপে উঠি', অমোঘ কথা অন্ধকারে ফাটল। সে বলতে লাগল, 'ক্ষেপে না উঠলে আর ভরসা নেই, আমরা খাব কেমন করে, বাঁচব কি করে, চল আমরা সবাই ক্ষেপে উঠি, অত্যাচার কোন মান্ষে করে— আমার জমি নেই, আমরা

কি বানের জলে ভেসে এসেছি— অজন্মায় নিরিক দিয়েছি— চাষী খাতক উচ্ছেদ! আমরা ক্ষেপে না উঠলে উপায় নেই খুড়ো, খুড়ো তুমি আমাদের কোম্পানি যে।' [*গল্পসমগ্র,* পৃ. ৫৩]

কিন্তু খুড়ো জনসমুদ্রে স্রোতের কুটো; ক্ষেপে ওঠবার রক্ত তার নয়। নিজ সমাজে সে অথর্ব ও নপুংসক হিসেবে পরিচিত। যদিও বিষ্টুখুড়ো জানায় তার শারীরিক অক্ষমতার কথা, প্রকৃতপক্ষে তা সামাজিক সত্য। বিত্ত ও ক্ষমতায় যে আন্তঃসমঝোতা বিষ্টুখুড়ো তারই গহ্বরবাসী; স্বাভাবিক বিত্তের ধর্মে সে স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত এবং আলমের বিপরীত। সে জন্যই কথার মায়াজাল, ধূর্ততায় স্বার্থপরতা চেপে উপদেশে মহানুভব : 'ওসব তাতে কাজ নেই, জলে বাস করি কুমীরের সঙ্গে বখেড়া, তার উপর বাত দাঁতে ব্যথা, তোমায় ভাল কথা বলি– আমায় যা বললে, আর কাউকে বোলো না, ছ-আনির বাবু যার নাম বাবু প্রশাদ চন্দর মিত্তির— শালা শুনতে পেলে...।' বিত্ত ও ক্ষমতার চক্রে যে শ্রেণীকাঠামো তাতে জমিদার ও বিষ্টু সম্পর্কীয় না হলেও পারস্পরিক সুবিধালগ্ন এবং বিষ্টুও পরোক্ষে শোষক। আশাহত আলম বিষ্টুখুড়োর বিত্ত সংগ্রহের ইতিবৃত্তে 'মামীনষ্টে'র ইঙ্গিত করলেও তার লক্ষীমন্ত 'মরাই'গুলোর প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। লেখকের অন্তশ্চেতনা ধনসংগ্রহের কদর্যতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং তার স্বাভাবিক বিরোধাভাসও স্পষ্ট আলমের মনোভঙ্গিতে। বিষ্টুখুড়ো কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে আলম আলিজানকে জানায় 'ক্ষেপে ওঠা ছাড়া আমাদের আর গতিক নেই, উঠতেই হবে, একজোট হয়ে চল ক্ষেপে উঠি।' কিন্তু আলমের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলিজানের কোনো দ্বিধা না থাকলেও 'বড্ড একা'র কথা বলে। আলম বুঝতে পারে না 'আলিজান, সে, নিধু, বলরাম, পাঁচু... এত লোক তবু তারা একা, কেন?' এই প্রশ্ন লেখকের সচেতন উপস্থিতিতে উদ্ভাসিত। জনসংযোগ, আত্মীয়তা ও দায়িত্ববোধের অভাব তাদের অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতার মূল কারণ। অবিশ্বাস সে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করেছে তা থেকে তাদের মুক্তি নেই। সহজাত জীবনাকাঙ্ক্ষা ও সুবিধাবাদ তাদের অনৈক্যসূত্র— সকলেই মরছে, মরতেও অরাজি নয়, তবু একতাবদ্ধ হতে পারছে না। ফলে প্রতিবাদের যৌথভাষা একাকীত্বে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। লেখক জানায় : 'বড্ড একা, কিন্তু ভগবানের সন্তান আর পরস্পর ভাই— তাদের বুকে বল নেই— তারা কি কালকূটের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না? তারা নিঃসঙ্গ, সত্যিই বড্ড একা একা—। আল দেওয়া জমির মত একা— জমি তো

সব এক!' এই বিভেদ চিহ্নিত মানুষ প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পায় না, তারা আত্মবিনষ্টির পথে এগিয়ে যায়। আলিজান বিষ্টুখুড়ো ও জমিদারের ভয়ে গামছাবাধা খাবারসহ আলমকে পথে নামিয়ে দেয় এবং আলমেরও মনে হয় 'সে জিতেছে এই তো খাবার।' বেঁচে থাকার জন্য খাবারের প্রয়োজন এবং এজন্যে 'ভিক্ষা ছাড়া তার গতিক নেই'।

পরিণতি-প্রান্তের দ্বিতীয় উপশিরোনাম 'এইভাবে শেষ হয়েছে শুনি।' এটি কেবল সংশয় নয়, জীবনপাঠেরও মুক্তি সন্ধান। মৃত্যুভীতি-আক্রান্ত আলম টুলটুলী ছেড়েছে এবং কেবল বেঁচে থাকার প্রয়োজনে চোখ নষ্ট করে দিতে চাস, কেননা তাতে 'মনের সাদে ভিক্ষে করতে পারবে। আলমের সঙ্গে রাখ তেমনিও স্ত্রীর সংলাপ :

'হামার ওষুদ— বল এটা কি?' গোটাকতক ধান ছিল— 'ধানরে বেটা (ধানের রঙ হলুদ না!) যা তোর খুব ভিক্ষে মিলবে, বাবুদের দয়া হবে—'

> 'আমায় পৌঁছে দেবে কে— রাখ ডোমনী মা আমার—'
>
> 'সে ভাবনা নেইক, বদনীয়ার বাপ যাবে, চৌকিদার', সে ওখান থেকে ডাকলে, 'হে-বদনীয়াগে, বাপকে বল্ একটি আন্ধাকে হাটখোলা পৌঁছে দেবে।'
>
> টীউবওয়েলের শব্দ আসে, এটা কি টুলটুলী? বাবুরা হয় সজ্জন। টীউবওয়েলের কলের শব্দ আসে, কে যে যেমন জল নেয়, এটা কি টুলটুলী! হু'- আনির বাবুরা সজ্জন।
>
> 'দেখ বউ— এবার ভিক্কে মিলবে রে আমি রাখ ডুমনীর ওষুদ খেয়েছি— জমি গেছে তাতে কি— খাবার আর ভাবনা নেই— ভিক্কে পাব রে আমার ওপর সবার দয়া হবে রে—' এখনও তার গলায় লাঙ্গলের শ শ সুর গলার আওয়াজে আওয়াজে। [গল্পসমগ্র, পৃ. ৫৭]

প্রতিবাদহীনতায় কৃষকের ভিক্ষুকে পরিণত হওয়ার মাধ্যমে গল্পের পরিসমাপ্তি। 'জল' ও 'তেইশ' গল্প দুটিতেই কৃষক জীবনের সামাজিক অবসাদ পরিলক্ষিত হয়। অনৈক্য, অবিশ্বাস ও প্রতিরোধহীনতায় 'তেইশ' গল্পে আলম-আলিজান-নিধু-বলরাম-পাচু প্রমুখ এবং 'জল' গল্পে ফজল-নন্দ বিপর্যস্ত ও

উদ্দেশ্যহীন। পরিণামে তারা আত্মবিনষ্টি ও নিঃশেষের পথে এগিয়ে যায়। কমলকুমারের গল্পে উত্থানের স্বপ্ন থাকে কিন্তু, শেষ পর্যন্ত তার বাস্তবায়ন হয় না। 'তাহাদের কথা', কয়েদখানা' 'রুক্মিনীকুমার' প্রভৃতি গল্পেও জীবনস্বপ্ন গল্পের শেষাংষে এসে অবসাদ ভারক্রান্ত ও বিপন্ন। উত্থানের স্বপ্ন ও তার বাস্তবতার বৈপরীত্য প্রতীকী উপস্থাপনায় বিন্যস্ত করেছেন কমলকুমার[৫], তবু ব্যক্তির অস্তিত্ব সংকটের যন্ত্রণা অস্বীকৃত হয়নি।[৬] 'জল' গল্পে ফজল ও নন্দখুড়োর অস্তিত্ব সংকটের প্রেক্ষাপটে লণ্ঠনকর্মকে কমলকুমার শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি দেননি। 'ফজল হয় ভাল লোক' বাক্যটি 'থীম মিউজিকে'র[৭] মতো বারবার ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি বাস্তবতার অতিরিক্ত হৃদয়সত্যকে আহ্বান করেছেন। ফলে অন্তর ও বহির্চাপে ফজল অস্থির অসুস্থ ও পলায়নপর। জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস ও ক্ষমতা হারিয়ে শেষ পর্যন্ত ফজল নিরুদ্দেশ যাত্রা করে। 'তেইশ' গল্পে বাস্তবতার অনড় 'পিঞ্জরতুল্য অপরিবর্তনীয়তায়' আলমের 'নিরুপায় অস্তিত্বে'র যন্ত্রণা-কাতরতা দৃষ্ট হলেও পরিবর্তনের দ্রোহ ও সংঘবদ্ধতার কোনো ইঙ্গিত নেই।[৮] কমলকুমার দুটি গল্পেই বাস্তবতা সম্পর্কে বিরোধাভাস সৃষ্টি করেছেন; 'জল' গল্পে ফজলের উদ্দেশ্যহীনতা 'আমি দেশত্যাগী হব', তেমনি 'তেইশ' গল্পে আলমের সংঘবদ্ধতার সামাজিক আহ্বান ব্যর্থ হলে সে নিজেকে অন্ধ করে ভিক্ষুকে পরিণত হয়।

অস্তিত্বের নিরুপায়তায় ফজল কিংবা আলম উত্তরণের পথ খুঁজে পায়নি। গল্পের নিজস্ব যুক্তি পরম্পরায় পরিণতি পর্ব উদ্ভাসিত হয়েছে, যা কোনো দার্শনিকতায় চিহ্নিত হয়নি। ভূমিকেন্দ্রিক সামন্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর প্রতিবাদ ও সংঘহীনতায় ব্যক্তিত্বকাঠামো নির্ধারিত। ফলে তারা একাকীত্বকে অনুভব করে সত্য, কিন্তু আত্মসচেতনতায় তা থেকে উত্তীর্ণ হতে পারে না। সামাজিক বাস্তবতার পরাভব চেতনাই কমলকুমার মজুমদারের গল্প দুটির কেন্দ্র বিন্দু।

তথ্য নির্দেশ

১. ক. দ্রষ্টব্য ঃ কমলকুমার মজুমদার, *গল্পসমগ্র,* আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯২

খ. দ্রষ্টব্য ঃ নবনীতা দেবসেন, *বাংলা ছোটগল্পের গদ্যশৈলী*, পরিবেশক : পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০২, পৃ. ২২-২৪

২. বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, *কাব্যবীজ ও কমলকুমার মজুমদার,* নবার্ক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫, পৃ. ১১
৩. কমলকুমার মজুমদার সাক্ষাৎকারে বলেছেন : 'থীম প্রধান বিষয়ে লেখা উচিত কেননা গল্প বলতেই তাই।' 'সাক্ষাৎকার : কমলকুমার মজুমদার', উৎপল ভট্টাচার্য সম্পাদিত *কবিতীর্থ,* কলকাতা, বিংশতিবর্ষ গ্রীষ্ম-বর্ষা ১৪০৮, পৃ. ৭৭
৪. অনিরুদ্ধ লাহিড়ী 'তাহাদের কথা' 'কয়েদখানা' ও 'রুক্মিনীকুমার' গল্পত্রয়কে স্বপ্নবাস্তবতার উত্থানপর্ব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু 'তাহাদের কথা' গল্পের শিবনাথ 'লৌহের শৈত্য আপনকার গালে অনুভব করত বলেছেন, খুব ঠাণ্ডারে, খুব ঠাণ্ডা।' দেবেশ রায় গল্পগুলোতে বাস্তবতা সম্পর্কিত বিরোধাভাস লক্ষ করেছিল। দ্রষ্টব্য : ক. অনিরুদ্ধ লাহিড়ী, 'প্রসঙ্গ ঃ কমলকুমার মজুমদার' প্রদীপ ভট্টাচার্য সম্পাদিত *রক্তকরবী,* প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংকলন, জানুয়ারি-মে ১৯৯২, পৃ. ১৪-১৫; খ. দেবেশ রায়, 'অভিনব ব্রতকথা', *সময় সমকাল,* অন্বেষা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪, পৃ. ৪২-৪৩
৫. তপোধীর ভট্টাচার্য, *উপন্যাসের প্রতিবেদন,* র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১০৩
৬. রফিক কায়সার, *কমলকুরাণ,* একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা, একুশে সংস্করণ ২০০১, পৃ. ৩
৭. কাব্যবীজও কমলকুমার মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২
৮. *সময় সমকাল,* 'অভিনব ব্রতকথা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩